বঙ্গবন্ধুর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*
তুলনামূলক পাঠ

ড. মোহাম্মদ হাননান

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমসাময়িক অনেক রাজনীতিকই আত্মজীবনী লিখেছেন। তবে তাঁদের বেশিরভাগই লিখেছেন মুক্তজীবনে থেকে অথবা ক্ষমতায় আসীন অবস্থায়। এঁদের মধ্যে আতাউর রহমান খানের *ওজারতির দুই বছর, স্বৈরাচারের দশ বছর;* আবুল মনসুর আহমদের *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর;* জেনারেল আইয়ুব খানের *প্রভু নয় বন্ধু;* অলি আহাদের *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫-১৯৭৫;* খোকা রায়ের *সংগ্রামের তিনদশক;* মহিউদ্দীন আহমেদের *আমার জীবন আমার রাজনীতি* প্রমুখের গ্রন্থ বেশ আলোচিত ও পরিচিত।

কিন্তু বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনীটি যতটুকু পাওয়া গেছে, তা লেখা হয়েছে বন্দিজীবন থেকে। সেদিক থেকে এটি ব্যতিক্রম। তিনি এটা লেখার জন্য তাঁর সমসাময়িকদের সঙ্গে আলোচনা করার সুযোগ পাননি। ঘটনাসমূহ যাচাইয়ের জন্য কোনো বই, সংবাদপত্র বা অন্যান্য তথ্য আধারের সাহায্যও নিতে পারেন নি। *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* পড়তে পড়তে মনে হয়, তিনি লিখে গেছেন বিরামহীনভাবে কোনো কিছুর বা কারো সহায়তা ছাড়াই।

লেখালেখির এ সীমাবদ্ধতার মধ্যেও তাঁর আত্মজীবনী কতটুকু ইতিহাসের ধারাবাহী হয়েছে, ঘটনা বর্ণনা কতটুকু হয়েছে অনুপুঙ্খ, তা সমসাময়িকদের আত্মজীবনীর সঙ্গে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে বিস্মিত হতে হয়। বঙ্গবন্ধুর অসাধরণ ইতিহাস জ্ঞান ইতিহাসবিদদের মুগ্ধ করে। ঐতিহাসিক ঘটনাবলির বিবরণ তিনি যেভাবে তুলে ধরেছেন তা তাঁকে অন্যদের থেকে আলাদা মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে। কয়েকটি ঘটনার তুলনামূলক পাঠ বিশ্লেষণ করলে এর সত্য অনুধাবন করা সম্ভব হবে।

কৈশোরে গোপালগঞ্জে একটি ঘটনাসূত্রে পুলিশ কিশোর মুজিবকে গ্রেফতার করতে খুঁজছিল। একজন আত্মীয় এসে গ্রেফতার এড়াতে পালানোর পরামর্শ দিলে মুজিব বলেন, 'আমি পারব না'। *(অসমাপ্ত আত্মজীবনী,* পৃষ্ঠা ১২)। বঙ্গবন্ধু বিরোধী একজন রাজনীতিক অলি আহাদ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 'গণআন্দোলনের প্রয়োজনে শেখ সাহেব কখনও আত্মগোপন করেন নাই'। (অলি আহাদ : *জাতীয় রাজনীতি* ১৯৪৫-১৯৭৫, পৃষ্ঠা ৪৮৩)।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চে ও বঙ্গবন্ধুকে পালানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তান পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান পালাতে অস্বীকার করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে এক বক্তৃতায় এ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'মার্চের সেই রাতে আমাকে ছেড়ে যাবার সময় আমার সহকর্মী তাজউদ্দীন, সৈয়দ নজরুল, ও অন্যান্যরা কাঁদছিলেন। কিন্তু আমি বলেছি, এখানেই আমি মরতে চাই। তবুও মাথা নত করতে পারব না'। (১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে রেসকোর্সের জনসভায় বক্তৃতা, *দৈনিক বাংলা, ১১ই জানুয়ারি ১৯৭২)*।

পাকিস্তান আমলের আরেকটি ঘটনা। মুজিবকে গ্রেফতার করতে হুলিয়া জারি হয়েছে। মাওলানা ভাসানী খবর পাঠালেন, মুজিব যেন পালিয়ে থাকে। মুজিব এ ঘটনা বর্ণনা করে লিখেছেন, 'তখন মাওলানা ভাসানী ইয়ার মোহাম্মদ খানের বাড়িতে থাকতেন। ... তিনি কেন আমাকে গ্রেফতার হতে নিষেধ করেছেন? আমি পালিয়ে থাকার রাজনীতিতে বিশ্বাস করি না। কারণ, আমি গোপন রাজনীতি পছন্দ করি না।... মাওলানা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম। 'কি ব্যাপার, কেন পালিয়ে বেড়াব'। (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী,* পৃষ্ঠা ১৩৪)।

অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে বঙ্গবন্ধু অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী (১৯৪৭ পূর্ববর্তী) এবং পাকিস্তানেরও প্রধানমন্ত্রী (১৯৪৭ পরবর্তী) হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দী সম্পর্কে অনেক মূল্যায়ন ও মন্তব্য করেছেন, 'শহীদ সাহেব ছিলেন উদার, নীচতা ছিল না, দল-মত দেখতেন না, কোটারি করতে জানতেন না, গ্রুপ করারও চেষ্টা করতেন না।... বাঙালিরা শহীদ সাহেবকে প্রথম চিনতে পারে নাই। যখন চিনতে পারল, তখন আর সময় ছিল না'। *(অসমাপ্ত আত্মজীবনী,* পৃষ্ঠা ৪৭-৪৯)। বাংলাদেশের রাজনীতিকদের নিয়েই বঙ্গবন্ধুর এ মন্তব্য। তবে পরবর্তীকালে ন্যাপ নেতা অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ তাঁর স্মৃতিকথায় সোহরাওয়ার্দীর যথাযথ মূল্যায়ন করে লিখেছেন, 'দেশ ভাগ হওয়ার পর কলকাতায় দাঙ্গা শুরু হয়। সমস্ত মুসলিম... ঢাকার পথে পাড়ি দেয়। সবারই আগে খাজা নাজিমউদ্দিন...। সোহরাওয়ার্দী সাহেবই একমাত্র লোক দাঙ্গা বিধ্বস্ত মুসলিম আম জনতার পাশে রয়ে যান'। (মোজাফফর আহমদ, *কিছু কথা,* পৃষ্ঠা ৪২-৪৩)।

কিন্তু সেদিনের বামপন্থী কমিউনিস্ট ও ছাত্রকর্মীরা হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দীকে চিনেনি, তাঁর সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করতেন, আজো তাঁরা তা সংশোধন করেন নি। ২০০৫ সালে কমরেড হায়দার আকবর খান রনো তাঁর আত্মজীবনী প্রকাশ করেন। এতে সোহরাওয়ার্দী সম্পর্কে অনেক কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য রয়েছে। ১৯৬২-র ছাত্র আন্দোলনের সময় সোহরাওয়ার্দী যখন ঢাকায় আসেন তখন ছাত্র নেতাদের সাথে তাঁর তর্ক-বিতর্ক হয়। রনো লেখেন, 'সোহরাওয়ার্দী সাহেব আমাদের প্রজন্মের তরুণদের চিনতেন না।... যুক্তি-তর্কের এক পর্যায়ে কাজী জাফর আহমদ বলেই বসলেন, 'আমরা আমতলা থেকেই আপনাকে মুক্ত করে এনেছি, আবার আমতলাতেই আমরা কবর দিতে পারি'। (হায়দার আকবর খান রনো : *শতাব্দী পেরিয়ে,* পৃষ্ঠা ৫৯)। সম্প্রতি চীনপন্থী কমিউনিস্ট নেতা এবং সাবেক মন্ত্রী রাশেদ খান মেননেরও আত্মজীবনী প্রকাশিত হয়েছে। তিনিও এ ঘটনার উল্লেখ করে লিখেছেন, 'ছাত্রনেতাদের এই আচরণে সোহরাওয়ার্দী খুব বিরক্ত হন। কিন্তু 'কাজী জাফর আগের মতোই উত্তেজিত হয়ে বললেন, আমরা আমতলার থেকে আপনাকে নিয়ে এসেছি, ওই আমতলাতেই কবর দেব'। (রাশেদ খান মেনন : *এক জীবন,* পৃষ্ঠা ৯২)। বঙ্গবন্ধু অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে যে লিখেছেন, 'বাঙালিরা শহীদ সাহেবকে প্রথম চিনতে পারে নাই'। (পৃষ্ঠা ৪৭) বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে দেখতেন, একদল বাঙালি এখনও সোহরাওয়ার্দীকে চিনতে পারে নাই। প্রকৃতপক্ষে হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দী আমতলা বা জামতলার লোক ছিলেন না । তিনি সে সময়ের সমগ্র পাকিস্তানের অভিজাত বংশ থেকে আসা একজন রাজনীতিক ছিলেন, একমাত্র যিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে রাজনীতি করেছেন, যাঁর তুলনায় সে সময়ের পাকিস্তানের একজনও ছিল না, এমনকি খাজা-নবাবজাদা নাজিমউদ্দিন-লিয়াকত আলী খানরাও ছিলেন না। *অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে* বঙ্গবন্ধুর আফসোসটি সে কারণে বড়ো হয়ে দেখা দেয় যে বাঙালিরা শহিদ সোহরাওয়ার্দীকে 'চিনতে পারে নাই'।

১৯৪৮ সালের ১৬ই মার্চ রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা নিয়ে এক শ্রেণির লেখক যে উপহাস করে মিথ্যে ইতিহাস লিখেছেন, তার তুলনামূলক পাঠটি দেখুন। *অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে* বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, '১৬ তারিখ (১৬ই মার্চ ১৯৪৮- লেখক) সকাল দশটায় বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ ছাত্রসভায় আমরা সকলেই যোগদান করলাম। হঠাৎ কে যেন আমার নাম প্রস্তাব করে বসল সভাপতির আসন গ্রহণ করার জন্য। সকলেই সমর্থন করল। বিখ্যাত আমতলায় এই আমার প্রথম সভাপতিত্ব করতে হল'। *(অসমাপ্ত আত্মজীবনী,* পৃষ্ঠা ৯৬)।

ভাষা আন্দোলনের লেখক- গবেষক বদরুদ্দিন উমর এ ঘটনাকে উপহাস করে লিখেছেন, '১৬ তারিখে ... বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ সভার নির্ধারিত সময়ের কিছু পূর্বেই বেলা দেড়টার সময় শেখ মুজিবুর রহমান কালো শেরোয়ানী এবং জিন্নাহ টুপি পরিহিত হয়ে একটি হাতলবিহীন চেয়ারে সভাপতির আসন অধিকার করে বসেন'। (বদরুদ্দিন উমর : *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি,* প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮২-৮৩)।

১৯৪৮ সালের এই প্রথম পর্বের ভাষা আন্দোলনের প্রধান ছাত্র-নেতাদের মধ্যে ছিলেন অলি আহাদ। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে এ ঘটনা সম্পর্কে লিখেছেন, '...আমরা ১৬ই মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বেলতলায় এক সাধারণ ছাত্রসভা আহ্বান করি। সদ্য কারামুক্ত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান সভায় সভাপতিত্ব করেন'। (অলি আহাদ: *জাতীয় রাজনীতি,* পৃষ্ঠা ৫৯)। যদি ছাত্রসভায় মুজিবের সভাপতিত্ব করার কথা না থাকত, তাহলে অলি আহাদ সেটা লিখতেন, কারণ অলি আহাদ আমৃত্যু বঙ্গবন্ধুকে 'শত্রু' মনে করে গেছেন। অথচ উমর সহেবরা মিথ্যে ইতিহাস লিখে গেছেন, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* বের হওয়ার পরও এটা সংশোধন করেন নি।

বঙ্গবন্ধু তাঁর আত্মজীবনীতে পাকিস্তানের রাজনীতিতে আমলাদের কলকাঠি নাড়া ও ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অনেক তথ্য দিয়েছেন। লিখেছেন, 'গোলাম মোহাম্মদ পাকিস্তান হওয়ার পূর্বে একজন সরকারি কর্মচারী ছিলেন। তাঁকে অর্থমন্ত্রী করার ফলে আমলাতন্ত্র মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর মৃত্যুর সাথে সাথে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। চৌধুরী মোহাম্মদ আলী কেন্দ্রীয় সরকারের সেক্রেটারি জেনারেল হয়ে একটা শক্তিশালী সরকারী কর্মচারী গ্রুপ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। পূর্ব বাংলায় আজিজ আহমদ চিফ সেক্রেটারি ছিলেন। সত্যিকার ক্ষমতা তিনিই ব্যবহার করতেন। নূরুল আমিন তাঁর কথা ছাড়া এক পাও নড়তেন না'। *(অসমাপ্ত আত্মজীবনী,* পৃষ্ঠা ১৭৪)।

ভাষা আন্দোলনের সময় বাঙালি হয়েও বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন পূর্ববাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী এই নূরুল আমীন। পরবর্তীকালে নূরুল আমীন পাকিস্তানের রাজনীতিতে তাঁর ভূমিকা প্রসঙ্গে একটি চটি বই লিখেছিলেন। এতে তিনিও স্বীকার করেছেন, 'বৃটিশ আমলের সুসংগঠিত আমলাতন্ত্রের কিছু উচ্চাভিলাষি লোক, কায়েদে আজম ও লিয়াকত আলী খানের ইন্তেকালের পর কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থায় প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে'। অনত্র, 'পল্টনের জনসভায় (১৯৫২ সালের- লেখক) তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রীর খাজা নাজিমউদ্দিন উর্দুই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে... এটাও ছিল আমলাদের একটা চাল'। (নূরুল আমীন : *যে কথা এতোদিন বলিনি,* পৃষ্ঠা ৩)।

আবুল মনসুর আহমদ তাঁর সুবিশাল আত্মজীবনীতেও পাকিস্তানের আমলাতন্ত্র নিয়ে অনেক কথা বলেছেন, যা বঙ্গবন্ধুর তথ্যের পরিপূরক। লিখেছেন তিনি, 'তিনি (পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দী- লেখক) মি. কেরামতুল্লাহর বদলে মি. আজিজ আহমদকে বাণিজ্য দফতরের সেক্রেটারি নিযুক্ত করলেন। ...মি. আজিজ আহমদ শুধু সর্বজ্যেষ্ঠ আইসিএসই নন। 'মোস্ট স্টিফনেকেড ব্যুরোক্র্যাট' বলিয়া তাঁর বদনাম বা সুনাম আছে। মন্ত্রীদের কোনো কথা তিনি শোনেন না। মন্ত্রীদেরই তিনি কানি আঙ্গুলের চারপাশে ঘুরান। ...পূর্ববাংলার চিফ সেক্রেটারি থাকা অবস্থায় জনাব নূরুল আমিনের আমলে একবার তিনি হাইকোর্টের কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন, 'আমি প্রধানমন্ত্রীসহ সমস্ত মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে সিক্রেট ফাইল রাখি।... লোকে বলাবলি করিত আসলে চিফ সেক্রেটারিই পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী'। (আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির ৫০ বছর,* পৃষ্ঠা ৩৪৪-৩৪৫)।

পাকিস্তানের রাজনীতির আমলাতন্ত্রের দীর্ঘ এক ফিরিস্তি রয়েছে এই *অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে*। বঙ্গবন্ধু এ বই লেখার সময় কোনো লাইব্রেরি ওয়ার্ক করার সুযোগ পাননি, লিখেছেন একেবারেই স্মৃতি থেকে। কিন্তু পরবর্তীকালে যাঁরা একই বিষয় নিয়ে লিখেছেন তাঁদের গ্রন্থের সঙ্গে পাঠ মিলিয়ে পড়লে দেখা যায়, বঙ্গবন্ধুর গ্রন্থে তথ্যের কোনো ঘাটতি নেই। বরং অসাধারণ এক সাযুজ্য ধরা পড়ে।

অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে এরকম অসংখ্য ইতিহাস ও তথ্য রয়েছে, যা সমসাময়িক অন্যদের লেখা আত্মজীবনীর সঙ্গে পাঠ মিলিয়ে পড়লে বঙ্গবন্ধুর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলির শক্তিটি ধরা পড়ে। সর্বশেষ একটি

বিষয় এখানে উদ্ধৃত করছি, সেটা হলো, বঙ্গবন্ধুর একটা দীর্ঘশ্বাস, 'বাঙালিদের দুঃখের দিন শুরু হল'। সেটা কোনদিন, 'পূর্ব বাংলার গভর্নর শাসন জারি করার দিন (১৯৫৪ সালের ৩০শে মে- লেখক) প্রধানমন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ আলী যে বক্তৃতা রেডিও মারফত করেন, তাতে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক সহেবকে রাষ্ট্রদ্রোহী' ও আমাকে 'দাঙ্গাকারী বলে আক্রমণ করেন। আমাদের নেতারা যাঁরা বাইরে রইলেন, তাঁরা এর প্রতিবাদ করাও দরকার মনে করলেন না। ঠিক মনে নাই, তবে এর তিনদিন পরে আমাকে আবার নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করা হল'। *(অসমাপ্ত আত্মজীবনী,* পৃষ্ঠা ২৭৩)।

আবুল মনসুর আহমদ এ প্রসঙ্গটা আরো খোলাসা করেছেন, তিনি লিখেছেন, 'পরদিন (৩১শে মে ১৯৫৪- লেখক) বেলা দুইটায় সিমসন রোডস্থ যুক্তফ্রন্ট অফিসে যুক্তফ্রন্ট পার্টির এক সভা ডাকা হইল। ...পার্টি লিডারকে নজরবন্দী ও অন্যতম মন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হইল। ...আমরা বেশ কয়েকজন তখন হক সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়া সমস্ত অবস্থা ও আমাদের সিদ্ধান্তের কথা জানাইলাম।... হক সাহেব আমাদের ... গোলাবি চিত্রে টলিলেন না। .. বুঝিয়া আসিলাম শেরে বাংলা হক সাহেব বেশ একটু ভয় পাইয়াছেন'। *(আমরা দেখা রাজনীতির ৫০ বছর,* পৃষ্ঠা ২৮০-২৮১)।

তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান লিখেছেন এর পরের পাঠটি : 'শেখ মুজিবুর রহমান ও আবুল মনসুরের নামে একাধিক মামলা দায়ের হলো।... শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহের অভিযান খুব ব্যাপক। দেশের সর্বত্র কর্মীদের নিয়ে টানটানি হয়েছে। ... শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, দুর্নীতি বিভাগের বেতনভুক্ত পোষ্য কয়েকটি দালাল ছাড়া আর কোনো সাক্ষী কাঠগড়ায় আনতে পারেনি। ... শেষ পর্যন্ত একটা মোকাদ্দমা গেল জজকোর্টে। (উকিল হিসেবে – লেখক) সোহরাওয়ার্দী তাঁর পক্ষ সমর্থন করেন। জজ বাহাদুরকে অনুরোধ করা হলো, আসামিকে তাঁর উকিলের পাশে বসার অনুমতি দেওয়া হোক। মাঝে মাঝে পরামর্শ নিতে হবে, কাগজপত্র দেখাতে হবে। ধর্মাধিচরণ প্রায় গর্জে উঠলেন, নো।... দশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে রইল শেখ মুজিবুর রহমান। বিচারান্তে রায় দিলেন, জেল। হাইকোর্টে আপিল হলো। মহামান্য বিচারপতি তাঁকে (মুজিবকে – লেখক) নির্দোষ খালাস দিলেন'। (আতাউর রহমান খান : *স্বৈরাচারের দশ বছর,* পৃষ্ঠা ৫২-৫৩)।

বঙ্গবন্ধুর *অসমাপ্ত আত্মজীবনীর* তুলনামূলক পাঠ তাই ইতিহাসের জন্য জরুরি। আজকের প্রজন্মের জন্য আরো জরুরি। যেমন করে পাকিস্তান আমলে তিনি শেখ মুজিবুর রহমান থেকে বঙ্গবন্ধু হয়েছিলেন তার কাহিনি তো ছড়িয়ে আছে সমসাময়িক অন্যান্য রাজনীতিক ও ইতিহাসবিদদের স্মৃতিকথা ও গবেষণা গ্রন্থেও। এগুলো মিলিয়ে পড়লে *অসমাপ্ত আত্মজীবনীর* পাঠটির লেখনীর দৃঢ়তা, শুদ্ধতা এবং সঠিকতা অধিক পরিস্ফুটিত হয়।

প্রাবন্ধিক : লেখক ও গবেষক।